হঠাৎ শুরু হয়নি মুক্তিযুদ্ধ ঃ মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ (অব.)

মুক্তিযুদ্ধে ৩নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ও 'এস ফোর্স'-এর অধিনায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ (অব.), বীর উত্তম। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর হিসেবে তিনি ছিলেন জয়দেবপুরস্থ ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড'। ২৫ মার্চ ঢাকায় হত্যাযজ্ঞের খবর পেয়ে মেজর কে এম সফিউল্লাহ তার রেজিমেন্টের ৬ জন বাঙালি অফিসারসহ পুরো বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। '৭১-এর আগস্টেই তিনি লে. কর্নেল পদে উন্নীত হন। স্বাধীনতার পর '৭২ সালের ৭ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ নিযুক্ত হন। '৭৫ সালের ২৪ আগস্ট তাকে এ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৭১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী স্বাধীনতার যুদ্ধ। যুদ্ধ ৯ মাসের; কিন্তু এর নেপথ্যে যতো কথা, ততো কথা রণাঙ্গনেও। বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তাই ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঙ্গনে। তিনি রণকৌশল, বাহিনী গঠন, যুদ্ধ সংগঠিত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করার সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থণা ও অনুলিখন ঃ ইখতিয়ার উদ্দিন।

মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ (অব.), বীরউত্তম ঃ মুক্তিযুদ্ধটা হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়নি। এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে পর্যায়ক্রমে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের ২৩ বছরের বৈষম্য, শোষণ ও নির্যাতনের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলার মানুষ। তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ। এই ক্ষোভই ধীরে ধীরে একটি স্বাধীন স্বদেশভূমি গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে তিনি হয়ে ওঠেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। এ অবস্থায় আসে '৭০-এর নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল অনেকটা রেফা-রেন্ডামের মতো। ৯৯ শতাংশ লোকই বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন করে। ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন। এ নির্বাচনের পর সাধারণ মানুষ মনে করেছিল এবার শোষণ-বৈষম্যের অবসান হবে কিন্তু তা হয়নি। আমি ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড। আমি তখন ব্যাটেলিয়ন নিয়ে জয়দেবপুরে ছিলাম। স্বাভাবিক কারণেই চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি নিবিড় নজর ছিল আমার। আমরা দেখেছি, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অভূতপূর্ব বিজয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর। কারণ তাদের কাছে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট ছিল শেখ মুজিব ৬০ থেকে ৭০ আসনের বেশি পাবেন না। নির্বাচনের ফলাফল দেখে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয় তারা। শুরু হয়ে গেলো অসহযোগ আন্দোলন। তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সারা দেশে। তার নির্দেশেই সবকিছু চলছিল। এমনকি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সমস্ত প্রশাসনও তার নির্দেশে চলছিল। তাঁর বাড়ি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর তখন কার্যত 'গভর্নমেন্ট হাউসে' পরিণত হয়েছিল। ইয়াহিয়া খান তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে সংলাপের প্রস্তাব দেয়। সংলাপ শুরু হয় '৭১-এর মার্চে। কিন্তু আমরা দেখলাম সংলাপ শুরু হওয়ার আগেই প্রচুর সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতে শুরু করলো। আমরা বুঝে নিলাম, এই সংলাপ আসলে টাইম কিলিঙের কৌশল। মার্চের ২০ তারিখের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ তিনগুন করে ফেলে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, আমাদের 'ডিজ আর্মড' করে ফেলবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে আমরা তা মেনে নেবো না। এ নিয়ে অবশ্য আমাদের মধ্যে আলোচনা হতো না। তবে মনে মনে আমাদের মধ্যে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তুতি ছিল।

৭ মার্চ যখন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে শুনছিলাম তখন হঠাৎ সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেলো। পুরো ভাষণ শুনতে পাইনি। ভাবলাম বঙ্গবন্ধু হয়তো স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ফেলেছেন; যে কারণে ভাষণ প্রচার করতে দিচ্ছে না। এ সময় ঢাকায় কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছিলাম না। পরদিন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে পুনঃপ্রচার হলে পরিস্থিতি বুঝতে পারি।

৭ মার্চেই আমার ব্যাটেলিয়নে বিদ্রোহের উপক্রম হয়। কিন্তু আমরা সেটা থামিয়ে দিই। কারণ বুঝতে পারছিলাম বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তারা আক্রমণের ছুতো পেয়ে যাবে। তাই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম, তারা আক্রমণ করলে আমরা প্রতিরোধ করবো। ১৯ মার্চ ঢাকা থেকে ব্রিগেডকমান্ডার জাহান জেই আরবাব জয়দেবপুর যায়। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের 'ডিজ আর্মড' করা হবে। তাই আমাদেরও প্রস্তুতি ছিল। তবে বিক্ষুব্ধ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে কিছু গোলাগুলি ছাড়া তেমন কিছু ঘটেনি। আমরা সিভিলিয়ানদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে শান্ত করি। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ক্র্যাক ডাউনের সংবাদ পাওয়ামাত্রই আমার সৈনিকদের একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিই। জয়দেবপুর থেকে ৬ জন বাঙালি অফিসারসহ পুরো রেজিমেন্ট নিয়ে ২৯ মার্চ ময়মনসিংহে পৌঁছাই। সেখানে সবাই মিলে শপথ গ্রহণ করি- স্বাধীনতার জন্য লড়বো। শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ।

ময়মনসিংহে গিয়ে জানতে পারলাম পাক সেনারা ঢাকা থেকে গিয়ে জয়দেবপুর আক্রমণ করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সৈন্যদের পাঠানোর জন্য তৈরি হচ্ছে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা আক্রমণ করবো। আমার পরিকল্পনা ছিল এক অংশ সাভারের দিক থেকে, এক অংশ টঙ্গী দিয়ে এবং অন্য অংশ বাসাবো দিয়ে আক্রমণ শুরু করবো। ৩১ মার্চ থেকে ১ এপ্রিলের মধ্যে আমার সৈন্যদের একটি গ্রুপ বাসাবো পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। আমি ভৈরবে এসে ঢাকা আক্রমণ না করার জন্য খালেদ মোশাররফের একটি বার্তা পাই। এই বার্তা পেয়ে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলার জন্য ট্রেন ইঞ্জিনে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই। সেখানে তার সঙ্গে কথা বলার পর সৈন্যদের ঢাকা অভিযান থেকে ফিরে আসার নির্দেশ দিই। কারণ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট পর্যন্ত এলাকান্তে মুক্তাঞ্চল গঠন করে যৌথভাবে ঢাকা আক্রমণ করবো। কিন্তু পরে পরিস্থিতির কারণে খালেদ মোশাররফকে তার সৈন্যদের নিয়ে কুমিল্লা চলে যেতে হয়। আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট অংশ দেখতে হয়। এ সময় ঢাকা ও সিলেট দুদিক থেকেই আমাকে আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়। দুদিকেই যুদ্ধ করতে হয়েছে। পাঁচদোনা থেকে এদিকে হামলা করেছি। ঐদিকে সিলেট শহরে ঢুকে গেছি। পরবর্তী সময়ে সিলেট থেকে সরে এসে শেরপুর-সাদিপুর মাধবপুর ও মনতলাতে যুদ্ধ করতে হয়েছে। আমার হেডকোয়ার্টার ছিল তেলিয়া পাড়ায়। এই সময় হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ট্রেনিং নিতে আসতে থাকে। আমার ব্যাটেলিয়নের বেশ কয়েকজন ইন্সট্রাক্টর তাদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। আমার এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের কাছে অন্তত ৩ ব্যাটেলিয়ন অস্ত্র ছিল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের হাতে এসব অতিরিক্ত অস্ত্র তুলে দিই।

ট্রেনিং দেওয়ার পর কনভেশনাল যুদ্ধের পাশাপাশি আমরা গেরিলা যুদ্ধও শুরু করি। আমার সেক্টর ছিল সিলেটের চুরামনকাঠি থেকে আখাউড়া, ঢাকার একাংশ, টঙ্গী, ভালুকা, নরসিংদী, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ এলাকা নিয়ে। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে ২১ জুন আমরা ভারতে প্রবেশ করি। আমরা প্রথমে কনভেনশনাল যুদ্ধ করেছি। পরবর্তী সময়ে অফেন্সিভ গেরিলা যুদ্ধে যাই। ২৯ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আখাউড়া দখল করি। পাকিস্তানি সৈন্যরা ওখানে সারেন্ডার করে। ডিসেম্বরের ৫ তারিখ থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করি। এর আগে ৪ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান ফোর্স আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ভারতীয় বাহিনী আখাউড়া থেকে আশুগঞ্জ ও উজানিশা ব্রিজ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আশুগঞ্জ এই দুটি পথে অগ্রসর হয়। আমি আখাউড়া থেকে মনতলা হয়ে সিলেট হাইওয়ে ধরে শাহবাজপুর, সরাইল পেরিয়ে আশুগঞ্জের দিকে আসি। আমি পথে পথে যুদ্ধ করে ৯ ডিসেম্বর আশুগঞ্জ-ভৈরব পৌঁছাই। ১১ তারিখ পর্যন্ত এখানে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়। পরে সৈন্যদের নিয়ে লালপুর থেকে রায়পুরা-নরসিংদী হয়ে ঢাকায় পৌঁছি ১৩ ডিসেম্বর রাতে। ১৪, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার উপকণ্ঠে যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে প্রবেশ করি। ঐদিনই পাকিস্তানি সৈন্যরা চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করে। ভারতীয় জেনারেল অরোরাকে স্বাগত জানাতে সাড়ে

৩টায় আমি বিমানবন্দরে যাই এবং সাড়ে ৪টায় রেসকোর্সে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হই। আর এভাবেই অর্জিত হয় ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বিজয়।